বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

যে কারণে ফিলিস্তিনের এই অবস্থা

[বাংলা – bengali – البنغالية]

লেখক: শাইখ আবুল হাসান আলী আন-নদভী

অনুবাদ: আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনায়: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ التربية والأخلاق التي مهدت للتخاذل في فلسطين ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي

ترجمة: علي حسن طيب

مراجعة: الدكتور محمد منظور إلهي

2011 - 1432
IslamHouse.com

যে কারণে ফিলিস্তিনের এই অবস্থা

মূল : সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী

ভাষান্তর : আলী হাসান তৈয়ব

মুসলমানদের দুর্বলতা কেবল বেড়েই চলেছে। দিন দিন তাদের আখলাক-শিষ্টাচার অবনতি ও অধোগতির দিকেই যাচ্ছে। তাদের কর্মকাণ্ড ও হাল-অবস্থার বিশৃঙ্খলা-বিস্রস্ততাও শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এমনকি হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর[1] ঊষাকালে তারা পরিণত হয়েছে এক শূন্যগর্ভ জাতিতে। যাতে নেই কোনো আত্মা কিংবা রক্ত। এরা ছিল একটি বড় কাঠের প্রাসাদ সদৃশ, ক্ষয়ে যাওয়া কাঠ নিয়ে যা কোনো মত দাঁড়িয়ে আছে। মানুষকে এটি আশ্রয় দিয়ে আসছে এবং দূর থেকে তাদের শঙ্কিতও করছে। কিংবা এরা ছিল যেন একটি বিশাল বৃক্ষ, যার শিকড়গুলো একটি আরেকটিকে খেয়ে ফেলেছে। প্রধান শিকড়েও ধরেছে পচন। তবে এখনো তা উপড়ে পড়ে নি।

তাদের দেশগুলো হয়ে পড়েছে পরিত্যক্ত সম্পদ, যাতে বাধা দেবার কেউ নেই। তাদের রাষ্ট্রগুলো পরিণত হয়েছে সব শিকারীর শিকারে এবং সব ভক্ষকের আহারে। তাদের সম্পর্কে করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীও প্রতিফলিত হয়েছে পূর্ণরূপে। তিনি বলেন,

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ « حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ».

"অচিরকালের মধ্যেই তোমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতিকে ডাকাডাকি করা হবে যেমন আহারকারীরা থালার দিকে ডাকাডাকি করে।" একজন জিজ্ঞেস করলেন, সেদিন আমরা সংখ্যায় কম থাকায় কি এমন হবে? তিনি বললেন, 'বরং তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে স্রোতের আবর্জনার মতো। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রু -হৃদয় থেকে তোমাদের ভয় কেড়ে নেবেন এবং তোমাদের অন্তরে 'অহান' ঢেলে দেবেন।' একজন প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, 'অহান' কী? তিনি বললেন, 'দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুর ভয়'।[2]

---

১. আরবী এ শতাব্দীর সূচনা ১৮৮৩ ঈসাব্দে।

২. আবূ দাউদ : ৪২৯৯।

মুসলমানদের এ অবস্থার আর উন্নতি হয়নি; তা বরং আরো খারাপের দিকে গেছে। এমনকি খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের ওপর সুসভ্য বর্বর ও পোশাকধারী উলঙ্গ খ্রিস্টান ইউরোপ হামলা করে বসে। তখন তারা নিজ দেশের চাবিগুলো তুলে দেয় তাদের হাতে। আর বিশ্ব নেতৃত্ব ত্যাগ করে তাদের স্বার্থে।

এ সময় মুসলমানরা নৈতিক অবক্ষয়ের সে স্তরে পতিত হয়েছিল যাতে এমন ব্যক্তির অভাব ছিল না, যারা স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এরা নাম মাত্র মূল্যে বিদেশিদের কাছে নিজ দেশ বিকিয়ে দিয়েছিল। শত্রু বাহিনীতে এরা শামিল হয়েছিল রাজাকার হিসেবে। উদারভাবে এরা নিজ দেশের কোষাগার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বিদেশি প্রভুদের খুশি করতে।

পাচ্যের (মঙ্গোলীয় ও তাতারিদের) হামলার চেয়েও পাশ্চাত্যের এ হামলা ছিল তীব্র, গভীর ও ব্যাপকতর। ফলে তাদের হৃদয়ে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা প্রতিটি অঙ্গার নিভে যাবার উপক্রম হলো। যাকে কয়েক শতাব্দীর ঝড়-ঝাপ্টাও পারেনি নেভাতে। যা ছিল ছাইয়ের ভেতরে লুকিয়ে- একবার আড়াল হয় আরেকবার জিহ্বা বের করে।

তাদের পণ্ডিতরা মুসলিম হৃদয়ে সুপ্ত শক্তি নিয়ে গবেষণা করে। তারা জানতে পারে এদের শক্তি ও প্রাণের প্রধান উৎস ঈমান। কারণ, ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে তারা দেখেছে অতীতে এ ঈমান কী করেছে! কী বিস্ময় আর চমক উপহার দিয়েছে! আর ভবিষ্যতেই বা তা কী উপহার দিতে পারে। তারা সিদ্ধান্তে আসে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় দু'টি শত্রুকে। যা এদের জন্য তাতারি ও মঙ্গোলীয়দের চেয়ে, এমনকি মহামারীর চেয়েও ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

প্রথম : সন্দেহ ও বিশ্বাসে দুর্বলতা। মানুষকে দুর্বল ও ভীরু বানানোর জন্য এরচেয়ে আর কার্যকর কোনো অস্ত্র হয় না। **দ্বিতীয় :** যাকে আমরা মানসিক বশ্যতা বা দাসত্ব বলে থাকি।[3] আর তা হলো, মুসলমানরা ভেতরে ভেতরে হীনতা ও দুর্বলতা অনুভব করে। তারা হেয় জ্ঞান করতে শুরু করে নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে। স্বকীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি চর্চায় বোধ করে লজ্জা ও সংকোচ। মুসলমানরা বিশ্বাস করতে লাগে ইউরোপীয়রা তাদের চেয়ে সর্বক্ষেত্রে উন্নত। ভালো যা আছে তাদের মধ্যেই। তাদেরও যে সীমাবদ্ধতা আছে, জীবনের নানা অঙ্গনে ব্যর্থতা ও কূপমণ্ডুকতা আছে- তা তারা কিছুতেই মানতে চায় না। ইতিহাসের কোনো বাঁকে তাদেরও যে নিদারুন পরাজয় ও অসহায় আত্মসমর্পন আছে- তা তাদের বিশ্বাস হয় না।

---

৩. আধুনিক লেখকরা একে বলেন থাকেন Inferiority Complex ।

মুসলিম-মানসে যখন এই দাসসুলভ মনোবৃত্তি গেড়ে বসেছে, বস্তুত তখনই তার অপমৃত্যু ঘটেছে। যদিও আমরা তাকে চলাফেরা করতে দেখি। পানাহার ও জীবন যাপন করতে দেখি। এ যাত্রায় মুসলমানদের বস্তুপূজা এবং দুনিয়াকে ভালোবাসার পশ্চিমা কৃষ্টি ও পাশ্চাত্য দর্শনের রোগ পেয়ে বসলো। ক্ষণিকের লাভের পেছনে দৌড়ানো এবং ব্যক্তি স্বার্থ ও জাগতিক লাভকে নৈতিকতা ও চারিত্রিক মূল্যবোধের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া মূলত বর্বর ইউরোপীয়দের বৈশিষ্ট্য। এই মানসিকতা ও চরিত্রই মুসলমানদের আল্লাহর পথে জিহাদ ও তাঁর কালেমা উচ্চ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, কষ্ট সহ্য করা, তিক্ততার ঢোক গেলা, ভয়-ভীতি ও ক্ষয়-ক্ষতি উপেক্ষা করা এবং বিশুদ্ধ আদর্শ ও মহান আকিদার জন্য কোরবান হবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

এসবেরই ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের এমন এক প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে, যাদের মস্তিষ্ক আলোকিত; কিন্তু হৃদয় তমসাচ্ছন্ন। যাদের অন্তর রিক্ত-শূন্য ও দুর্বল ঈমান সম্পন্ন। যাদের মধ্যে দীনদারি, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, উচ্চ বাসনা ও নৈতিকতার বড় অভাব। এরা দুনিয়ার বিনিময়ে নিজেদের দীনকে এবং বর্তমানের বিনিময়ে ভবিষ্যতকে বিকিয়ে দেয়। এরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে, ক্ষমতা-সম্মান ও পদ-পদবী পেতে গিয়ে স্বজাতি ও স্বদেশকে জলাঞ্জলী দেয়। নিজেদের ওপর, নিজেদের জাতির ওপর এদের মধ্যে আস্থার ঘাটতি রয়েছে। সম্পূর্ণরূপে এরা পরজীবী ও পরনির্ভর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾

'এবং যখন তুমি তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবে তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে। আর যদি তারা কথা বলে তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে। তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতই। তারা মনে করে প্রতিটি আওয়াজই তাদের বিরুদ্ধে।'[4]

এরাই মুসলমানদের মাঝে ভয় ও ভীরুতা ছড়িয়ে দিয়েছে। এরা মুসলমানদের আল্লাহ-ভরসা থেকে সরিয়ে এনেছে। তারপর নিজেদের ওপর থেকে আস্থা সরিয়ে পর নির্ভর হতে, পরের কাছে হাত পাততে এবং বিপদে তাদের সাহায্যপ্রার্থী হতে শিখিয়েছে।

এরা নিভিয়ে দিয়েছে মুসলিম মানসে সুপ্ত আল্লাহর পথে লড়ার আবেগ-শিখা ও দীনের তেজ। আর এ আবেগের উন্মত্ততাকে বদলে দিয়েছে নিষ্প্রাণ দেশাত্ববোধ ও ঝিমিয়ে পড়া জাতীয়তাবাদে। যে উন্মত্ততা সমাধি থেকে তুলে এনে জ্ঞানকে দান করেছে

---

[৪]. সূরা আল মুনাফিকুন : ০৪।

পুনর্জীবন এবং বুদ্ধিকে দিয়েছে বন্দিদশা থেকে মুক্তি। যে উন্মত্ততা হাজার বছর ধরে বুদ্ধি ও জ্ঞান যা করতে পারেনি তা করে দেখিয়েছিল। এই প্রজ্ঞাময় পাগলামিকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ বুদ্ধিতে রূপান্তর করে দিল। যে বুদ্ধি চেনে শুধু বাধা আর প্রতিবন্ধকতা।

চিন্তা-চেতনায় ও মন-মানসিকতায় এ বিশাল পরিবর্তন নগ্ন হয়ে পড়ে ফিলিস্তিন যুদ্ধের মন্দ দৃশ্যগুলোতে রূহ ও ঈমানের রিক্ততা ও নিঃস্বতায়। হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীতে এ ছিল আরব বিশ্বের জন্য এক লাঞ্ছনা ও অপমান। যেমন তারা সপ্তম হিজরিতে পূর্ণ ব্যর্থ ও পরাজিত হয়েছিল তাতারি বাহিনীর বিরুদ্ধে।

ফিলিস্তিনের এ যুদ্ধে সাত সাতটি আরব রাষ্ট্র জায়নবাদী ইহুদিদের মোকাবেলায় জোট বেঁধেছিল। একাট্টা হয়েছিল তারা আরবের এক পূণ্যস্নাত ইসলামি ভূখণ্ড, মুসলমানদের প্রথম কিবলা, যার উদ্দেশে সফর করা যায় এমন মসজিদত্রয়ের অন্যতম তথা বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষায় এবং আরব রাষ্ট্রসমূহ ও আরব্য দ্বীপের ওপর ইহুদিবাদের হুমকি মোকাবেলায়। হ্যা, ফিলিস্তিন যুদ্ধ ছিল জীবন রক্ষার যুদ্ধ। ছিল দীন, আকিদা ও সম্মান রক্ষার লড়াই।

সমগ্র আরব বিশ্ব ছিল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। যা বেশি দিন টিকবার নয়। সবার দৃষ্টি ছিল ফিলিস্তিন রণাঙ্গনের দিকে। মানুষ অপেক্ষায় ছিল আরেকটি ইয়ারমুক যুদ্ধ দেখার জন্য। আরেক হিত্তিনের লড়াই প্রত্যক্ষ করার জন্য। তারা কেনইবা অপেক্ষা করবে না। এ তো সে জাতিই। আকিদা আর চেতনাও তো সে একই। বরং তাতে যোগ হয়েছে অধিক সংখ্যা ও প্রস্তুতি!? কিন্তু এরপরও কেন আরবরা বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারলো না?! কেন পারলো না তারা শত্রুকে নাকানি-চুবানি দিতে?! অথচ তারা কেবল একটি বাস্তুচ্যুত শরণার্থী জাতি!

কিন্তু তারা ভুলে গেছে যুগের শিক্ষা আরব জাতিকে কত বদলে দিয়েছে। সময় তাদের কত বদলে দিয়েছে। রাষ্ট্রসমূহ ও রাজনৈতিক নেতারা কত বদলে দিয়েছে। আর বস্তুই বা তাদের কত বদলে দিয়েছে।

ইয়ারমুক যুদ্ধে আরবরাই বিজয়ী হয়েছিল সত্য; কিন্তু তা প্রথম যুগে তাদের পূর্বসুরীদের বিরল ও অনন্য ঈমানের বদৌলতে। তারা এমন লড়াইয়েও বিজয় মাল্য ছিনিয়ে এনেছেন, যা ছিল চূড়ান্ত আঘাত। যেমন হিত্তিনের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিজয় মাল্যে আরবরাই ভূষিত হয়েছিল বটে; কিন্তু তা সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও তাঁর মর্দে মুজাহিদ বাহিনীর সমৃদ্ধ রূহ ও আত্মার মাধ্যমে।

তাঁদের আত্মা অন্তসারশূন্য ছিল না যে তা মৃত্যুকে ভয় পাবে আর জীবনকে ভালোবাসবে। তারা বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারী কিংবা বিভিন্ন কালেমার বাহক ছিলেন না। যারা

শুধু জিততে চায়; কিছু হারাতে চায় না । যারা যুদ্ধ জয় করতে চায় কোনো ঝুঁকি না নিয়ে এবং নিজেদের মর্যাদা ও বিলাস ধরে রেখেই।

সবাই বিশ্বাস করে যুদ্ধ, যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের দায়-দায়িত্ব তার নয়; অন্যের। তারপর তারা লড়াই করতে যায় আর তাদের লাগাম থাকে অন্যের হাতে। যখন একটু ঢিল করে, তারা এগিয়ে যায়। যখন টেনে ধরে, তারা পিছিয়ে আসে। যখন বলে, যুদ্ধ করো, তখন তারা যুদ্ধ করে। যখন বলা হয়, তোমরা সন্ধি করো, তখন তারা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এভাবে না যুদ্ধ জয় হয় আর না পরাজিত করা যায় কোনো শত্রু কে।

ইসলামি যুদ্ধের ইতিহাসে বিশ্ব যে বিস্ময়কর ঈমান, শ্বাসরুদ্ধকর বীরত্ব ও সাহসিকতা, ধৈর্য, অকৃত্তিমতা, জীবনের প্রতি অবজ্ঞা, মৃত্যুকে স্বাগত জানানো, শাহাদতের তামান্না, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও ত্যাগের উপাখ্যান পড়ে এসেছে, তার পুনরাবৃত্তির অপেক্ষায় থাকলো। তারা অবশ্য ঈমানের কয়েক ঝলক আর বিদ্যুতের ন্যায় কয়েক চমক ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। এটি দেখিয়েছিলেন যুদ্ধের গুটিকয় আনুগত্য পরায়ন মুজাহিদ ভাই, যারা কেবল ঈমানের দাবি পূরণে, ইসলামের শত্রু প্রতিরোধেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। যারা আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। ধর্মীয় আবেগ আর ঈমানি জযবাই তাদের এ অভিযানে প্রেরণা যুগিয়েছিল। টেনে এনেছিল রক্তপিচ্ছিল রণক্ষেত্রে। তারা দীনকে সম্মানিত করেছেন। শত্রু অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেছেন। পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন অতীত ইতিহাসের। তাঁরা প্রমাণ করেছেন ঈমানাদারদের কাছে যে শক্তি, কর্তৃত্ব, সংগঠন এবং যুদ্ধ ও প্রতিরোধের প্রাণশক্তি রয়েছে সভ্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছে তা নেই।

আমি এ গ্রন্থে ইতিহাসের যেসব ঘটনা ও দৃষ্টান্ত বিবৃত করেছি এবং সমকালীন সাক্ষ তুলে ধরেছি আর ফিলিস্তিনও আমাদের চেয়ে বেশি দূরের নয়- তা থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামী ইতিহাস এবং মুসলমানদের অবস্থা-উন্নতির জোয়ার-ভাটার সম্পর্ক ঈমানের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে। ঈমান-বিধৌত আত্মিক শক্তির সঙ্গে। এবং এই জাতির শক্তির উৎস তাদের ভেতরে। আর তা হলো, কলব ও রূহ তথা আত্মা ও অন্তর।

অতএব কলব ও হৃদয় যখন নির্মিত হবে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং শেষ দীনের ওপর ঈমান ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে, রূহ ও আত্মা হবে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের অনলে পরিশোধিত, বক্ষ হবে দীনী জযবা ও ধর্মীয় আবেগে জ্বলন্ত উনুনের পাতিলের মতো ফুটন্ত ও টগবগে, মুসলমানরা তাদের বৈষয়িক শক্তি অর্জন সম্পন্ন করবে, শত্রু মোকাবিলায় সাধ্যমত প্রস্তুতিও চূড়ান্ত করবে, বিশ্বের বিদ্যমান অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-রক্তপাত, দুনিয়া ও আখিরাত বিষয়ে অজ্ঞতা ও

বিভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হবে এবং উপলব্ধি করবে, বর্তমান সময়টি ঠিক সে যুগেই ফিরে গেছে, যাতে ইসলামের আগমন ঘটেছিল আর বিশ্বও সে জাহিলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেছে যেখানে এর সূচনা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।'[5]

বিশ্বের এ অবস্থা অবলোকনে তাদের দয়া হয় এবং তারা দেখতে পায়, বিশ্ব পুড়ে যাচ্ছে; কিন্তু তার কাছে পানি নেই। ফলে তারা এ সর্বগ্রাসী আগুন নেভাবে সচেষ্ট হয়। আর এ জন্য তারা নিজেদের ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে, তাদের চোখের ঘুম উড়ে যায় এবং তারা এ থেকে পরিত্রাণের জন্য পাগলপারা হয়ে যায়, তখনই তারা এমন এক বিস্ময়কর শক্তিতে পরিণত হবে, বিশ্ব যাদেরকে পদানত করতে পারবে না। যদিও তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়। সব জাতি, সব বাহিনী ও রাষ্ট্র একাট্টা হয়। তখন আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর অলঙ্ঘনীয় ভাগ্যলিপি এবং সুউচ্চ কালেমাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣)﴾

'আর নিশ্চয় আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার কথা পূর্ব নির্ধারিত হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে।'[6]

আরও ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

'আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক।'[7]

---

[৫]. সূরা আর-রূম : ৪১।
[৬]. সূরা আস-সাফফাত : ১৭১-১৭৩।
[৭]. সূরা আলে-ইমরান : ১৩৯।